খুশবন্ত সিং

মহারাজা রণজিৎ সিং

অনুবাদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

শিখ জাতি
৩

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
শিখ জাতি ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়
রণজিৎ সিংয়ের বংশপরিচয়,
জন্ম এবং অভিভাবকহীন বছরগুলো ১৭

তৃতীয় অধ্যায়
পাঞ্জাব এবং আফগান অভিযান ২৩

চতুর্থ অধ্যায়
পাঞ্জাবের মহারাজা ৩৩

পঞ্চম অধ্যায়
অমৃতসর দখল এবং সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়
ইংরেজ এবং মারাঠা শক্তি ৫৬

সপ্তম অধ্যায়
একজন সৈনিকের পেশা ৬১

অষ্টম অধ্যায়
বন্ধু এবং নদী ৬৭

নবম অধ্যায়
কাঙরা দখল এবং পশ্চিম পাঞ্জাব সংযুক্তিকরণ ৮৯

দশম অধ্যায়
পাঞ্জাবি বিয়ে ৯৬

একাদশ অধ্যায়
কাশ্মীর এবং কোহিনুর হীরক ৯৮

দ্বাদশ অধ্যায়
আটকে বিজয় এবং কাশ্মীরে ব্যর্থতা ১০৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়
মুলতানের পতন ১১৪

চতুর্দশ অধ্যায়
কাশ্মীর এবং পেশোয়ার দখল ১২০
পঞ্চদশ অধ্যায়
রণজিৎ সিং এবং ফিরিঙ্গিরা ১৩১
ষোড়শ অধ্যায়
নওশেরার যুদ্ধ ১৪২
সপ্তদশ অধ্যায়
বন্ধুত্বের চারাগাছে পানি সিঞ্চন ১৫০
অষ্টাদশ অধ্যায়
সিন্ধু এবং সুবর্ণ বস্ত্রের ময়দান ১৫৮
ঊনবিংশ অধ্যায়
ব্রিটিশের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ ১৭৬
বিংশ অধ্যায়
যুবরাজ নও নিহালের বিয়ে এবং হোলি উৎসব ১৮৪
একবিংশ অধ্যায়
সিন্ধুতীরবর্তী অঞ্চলের সেনাবাহিনী ১৮৯
দ্বাবিংশ অধ্যায়

ভূমিকা

বহু বছরের মেধা ও শ্রমে এক ক্যালিগ্রাফার সুন্দর একটি কোরআন শরিফ তৈরি করেন। কিন্তু তিনি ভারতে এমন কোনো মুসলিম শাসককে পেলেন না, যিনি তার পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিয়ে সুদৃশ্য কোরআন শরিফটি কিনবেন। একপর্যায়ে তিনি লাহোরে এলেন পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী ফকির আজিজউদ্দিনের কাছে কোরআনটি বিক্রয়ের চেষ্টা করতে। তিনি ক্যালিগ্রাফারের কাজের প্রশংসা করলেও এর কাঙ্ক্ষিত মূল্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। তাদের দর-কষাকষির বিষয়টি মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের কানে এলে তিনি ক্যালিগ্রাফারকে তলব করেন। মহারাজা শ্রদ্ধার সঙ্গে কোরআন শরিফটি নিয়ে তার কপালে স্পর্শ করেন এবং তার এক চোখ দিয়ে লেখাগুলো পরখ করলেন। ক্যালিগ্রাফির চমৎকারিত্ব তাকে মুগ্ধ করল। তিনি তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার জন্য কোরআনটি ক্রয় করলেন। কিছুক্ষণ পর ফকির আজিজউদ্দিন তার কাছে জানতে চাইলেন, একজন শিখ হয়েও তিনি এত উচ্চ মূল্যে এমন একটি গ্রন্থ কেন কিনলেন, যা তার কোনো কাজেই লাগবে না। রণজিৎ সিং উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বর চেয়েছেন আমি যাতে আমার এক চোখ দিয়ে সকল ধর্মকে সমানভাবে দেখি। সে জন্য তিনি আমার আরেক চোখের আলো নিয়ে গেছেন।'

এ কাহিনি প্রামাণ্য নয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত পাঞ্জাবিদের মধ্যে কাহিনিটি প্রচলিত আছে। কারণ, মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের পক্ষেই পাঞ্জাবি মুসলমান, হিন্দু ও শিখদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল এবং একমাত্র তিনিই পাঞ্জাবকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার সম্পর্কে আরেকটি কাহিনি প্রচলিত আছে, যা আগেরটির মতোই অপ্রামাণ্য, কিন্তু আরো বেশি জনপ্রিয়—যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি কী করে ক্ষমতাকে এত সুসংহত করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে তার মুসলিম স্ত্রী মোহরান একবার তার কুৎসিত চেহারা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—তিনি কালো রঙের, মুখে বসন্তের দাগ এবং একটি চোখ নেই। তার মন্তব্য ছিল : 'ঈশ্বর যখন সৌন্দর্য বিতরণ করেছেন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন ?' মহারাজা উত্তর দেন, 'তখন আমি স্বয়ং গিয়েছিলাম একটি রাজ্যের অনুসন্ধানে।'

রণজিৎ সিংয়ের জীবনী-লেখকেরা তার প্রতি সুবিচার করেননি। হিন্দু এবং শিখরা তাকে বর্ণনা করেছেন একজন গুণী মানুষ ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হিসেবে। শিক্ষাজগতের পণ্ডিতেরা তার মতো বীর ও রাজনীতিবিদকে পরিণত করেছেন রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত সন্ন্যাসী ও সাধারণ জাতীয়তাবাদী হিসেবে। মুসলিম ইতিহাসবিদেরা তাকে লোভী দস্যু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজ ইতিহাসবিদেরা তাদের উপকরণের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন মুসলিম ইতিহাসবিদদের

তথ্যের ওপর এবং তারা তাকে চিত্রিত করেছেন একজন ধূর্ত মানুষ হিসেবে। যিনি নীতিবর্জিত এবং যার যাবতীয় দোষের মধ্যে একটিমাত্র ভালো বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব। তারা যে শুধু গুজবে কান দিয়েছেন তা নয়, বরং সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের সৃষ্ট ইতিহাসে স্থান দিয়েছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে রণজিৎ সিংয়ের সরকারের বিভিন্ন দিকের ওপর বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলোও প্রকৃতপক্ষে জানা ঘটনাসমূহের ধারাক্রম, যার সঙ্গে ইতিহাসের গতিপ্রবাহের কোনো মিল নেই। এর ফলে ধূমকেতুর মতো তার উত্থান এবং একইভাবে উল্কার মতো তার রাজ্যের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক আন্দোলনের পরিণতির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তীর থেকে কেউ যেমন সমুদ্রের ঢেউকে দেখে সৈকতে বিলীন হয়ে যেতে, সেভাবেই পাঞ্জাবি জাতীয়তাবাদের উপরিকাঠামোর নিচে যে প্রবল প্রবাহ, তা কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। এ প্রবাহের প্রবলতা তাকে ক্ষমতায় আরোহণ করিয়েছিল। একইভাবে শিখ রাজ্যের পতন শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের দুর্ভাগ্য ছিল না, বরং সমুদ্রের ঢেউয়ের ক্ষমতা যেভাবে সৈকতে এসে বিলীন হয়ে যায়, শিখ শক্তির প্রাবল্যও সেভাবে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

রণজিৎ সিং নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক অথবা লোভী দস্যু ছিলেন না। তিনি গুণীজনের আদর্শ কিংবা কামাসক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত বৈশিষ্ট্যের মানুষ। একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি তার সমসাময়িক দুজন বিশ্বব্যক্তিত্বের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন—এই দুজন হলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এবং মিসরের মোহাম্মদ আলী। তিনি সামান্য গোত্রপ্রধানের অবস্থান থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী ভারতীয় শাসকে পরিণত হন। হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম দিক হতে দুশমনের হামলা ঠেকানোর ক্ষেত্রে হাজার বছরের মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতীয় বীর ছিলেন। যদিও তিনি নিজের ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য শত শত সামন্ত জমিদারকে উচ্ছেদ করেছিলেন। তিনি তাদের হৃদয় জয় করতে সফল হন এবং তাদের অনেকে তার দরবারের বিশ্বস্ত অমাত্যে পরিণত হন। বিশ্ব ইতিহাসে এমন স্বৈরশাসক খুঁজে পাওয়া কঠিন, যারা কখনো ঠান্ডা মাথায় রক্তপাত না ঘটিয়ে রণজিৎ সিংয়ের মতো বিশাল সাম্রাজ্য গড়তে সক্ষম হয়েছিল। তিনি পাঞ্জাবের বিক্ষুব্ধ শিখ ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের তার সম্প্রসারণবাদী নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কাশ্মীরি ও পাঠানদের অধীনস্থ করে তার সাম্রাজ্যের সীমান্ত উত্তরে চীন ও আফগানিস্তান এবং দক্ষিণে সিন্ধুর মরুভূমি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। তার সাফল্যের পেছনে অন্যতম কারণ ছিল তার শাসনাধীন এলাকার জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনার উন্মেষ ঘটানো, যার ফলে পাঞ্জাবি চেতনা তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছিল। তার শিখ ও হিন্দু সৈন্যরা পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ রাজাদের পর্যুদস্ত করেছিল। তার মুসলিম নাজিবরা তাদের হিন্দুস্থানি, আফগানি পাঠান স্বধর্মাবলম্বীদের আবেদন অগ্রাহ্য করে 'বিধর্মী'দের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিবর্তে মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে

লড়েছিল। রণজিৎ সিং যে বছর মৃত্যুবরণ করেন, সে বছর কর্নেল শেখ বাসাওয়ানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম সৈনিকেরা খাইবার পাস অতিক্রম করে রণজিৎ সিংয়ের পতাকা নিয়ে যায় কাবুল পর্যন্ত এবং সেখানে রাজপথে বিজয়সূচক কুচকাওয়াজ করে। কয়েক বছর পর একজন ডোগরা হিন্দু জোরাওয়ার সিং শিখ পতাকা উত্তোলন করে তিব্বতের গভীরে। এ ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে পাঞ্জাবি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সাম্রাজ্যের শক্তিকে, যা রণজিৎ সিংকে ক্ষমতার শীর্ষে উন্নীত করেছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়।

মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের ব্যক্তিগত জীবন তার রাজনৈতিক জীবনের মতোই বর্ণাঢ্য ছিল। যদিও তিনি খুব সুদর্শন ছিলেন না, কিন্তু সুন্দরী রমণীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতে পছন্দ করতেন। আকৃতিতে তিনি ছিলেন খাটো এবং দেহও সুগঠিত ছিল না, কিন্তু তিনি ছিলেন সাহসী, অমিতবিক্রমের অধিকারী। বহু যুদ্ধে তিনি স্বয়ং সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছেন, নিজে তরবারি চালিয়েছেন। সৈনিকের জীবন যাপন করেছেন এবং একজন সাধারণ সৈনিকের মতোই তিনি আকণ্ঠ মদ্যপান করতেন। কিন্তু পান-ভোজন শেষ হলে তিনি গভীর রাত পর্যন্ত বসে চিঠিপত্র এবং অন্যান্য বিষয়ের নির্দেশনা দিতেন। যদিও তিনি তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন হিসাব করে, কিন্তু কোনো ঘোড়া যদি তার পছন্দ হতো, তাহলে সেটি আহরণের জন্য দ্বন্দ্বের প্ররোচনা সৃষ্টি করতেন। ঘোড়াকে তিনি সম্ভবত মানুষের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন। ইংরেজ কবি রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের কবিতার লাইন দুটি রণজিৎ সিংয়ের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রয়োজ্য :

> For things greater than all things are
> Women and Horses and power and war.
> 'সবকিছুর চেয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো
> নারী ও ঘোড়া এবং ক্ষমতা ও যুদ্ধ।'

রণজিৎ সিংয়ের ওপর কাজ করতে গিয়ে আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে :

১. সোহন লাল সুরীর ডায়েরি, যা তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ 'উমদাত-উল-তাওয়ারিখ'-এর সিংহভাগ জুড়ে আছে। এটি অনুবাদ করেছেন পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট আর্কাইভসের পরিচালক বিদ্যাসাগর সুরী। তিনি আমার কাজের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট ভলিউমগুলো আমাকে ধার দিয়েছিলেন।

২. লাহোরে রণজিৎ সিংয়ের দরবারে নিয়োজিত রাজন্য প্রতিনিধিদের চিঠিপত্র।

৩. ইংরেজ প্রতিনিধি ও কলকাতায় তাদের সরকারের মধ্যে বিনিময় করা চিঠিপত্র।

৪. রণজিৎ সিংয়ের দরবারে চাকরি করেছেন যেসব ইংরেজ অফিসার, তার দরবারে আসা পর্যটক ও দর্শনার্থীদের বিবরণী।

খুশবন্ত সিং

প্রথম অধ্যায়

শিখ জাতি

পাঞ্জাবের জনপদে জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় ধরে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ানো একজন লোক ১৪৯৯ সালের গ্রীষ্মে এক নতুন ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার দেশবাসীর সীমাহীন দুর্দশা প্রত্যক্ষ করার পরই তিনি এ সিদ্ধান্ত নেন। মানুষের স্মরণকাল থেকে পাঞ্জাব বিদেশি হামলাকারীদের পদানত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানের শাসকেরাও তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির জন্য হামলাকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আবার কখনো বিদেশিরা হামলা করেছে হিন্দুস্থান, সমৃদ্ধ দেশ এবং এখানকার জাতিগোষ্ঠীগুলোর অনৈক্যের কারণে এই ভূখণ্ড জয় করা সহজ বলে। যেহেতু হিন্দুস্থানে প্রবেশ করতে পাঞ্জাবেই প্রথমে পা রাখতে হয়, সে জন্য হামলাকারীদের হাতে পাঞ্জাবই সবচাইতে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। যে ভূখণ্ড ছিল সবুজ-শ্যামলিমায় ঢাকা, ক্রমে তা হয়ে পড়ে বৃক্ষহীন ধু ধু মরুতে, জলাভূমির চারপাশে শুধু চোখে পড়ে বালির বিস্তার। পাঞ্জাবের মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয় ধর্মের নামে, শস্যভান্ডার লুট করা হয় বিদেশি সেনাবাহিনীর আহার্য জোগাতে, গ্রামগুলোকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং রুক্ষ দুর্দান্ত পুরুষদের লালসার পরিতৃপ্তির জন্য ব্যবহার করা হয় এখানকার নারীদের। কিন্তু এত কিছুর পরও পাঞ্জাবিরা শিক্ষালাভ করেনি। তারা নিজেরা ছিল বহুধাবিভক্ত এবং হামলাকারীদের হামলা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলার পরিবর্তে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

১০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যারা পাঞ্জাবে হামলা করেছে, তাদের সবাই ছিল মুসলিম এবং তারা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত পাঞ্জাবের জনসংখ্যার অর্ধেককে তাদের ধর্মবিশ্বাসে দীক্ষিত করে ফেলতে সক্ষম হয়। বাদবাকি লোকজন ছিল হিন্দু। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘাত ছিল

অব্যাহত ঘটনা। তদুপরি পাঞ্জাবি মুসলমানদের দ্বৈত আনুগত্য ছিল। তাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী, তারা তাদের বিদেশি স্বধর্মীদের প্রতিও আনুগত্য পোষণ করত। এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাবে নতুন ধর্মবিশ্বাসের আবির্ভাব নতুন ধরনের আনুগত্যের ধারা সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তিন দিন, তিন রাত ধরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করে, নির্দেশনা লাভের জন্য প্রার্থনা করে লোকটি জনসমক্ষে হাজির হয়ে সহজ ও সাধারণ একটি ঘোষণা দিলেন : 'এখানে কোনো হিন্দু নেই, কোনো মুসলমানও নেই।'

লোকটির নাম নানক, শিখ ধর্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা। ১৪৬৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৫৩৯ সালে। হিন্দু বাবা-মায়ের ঘরে নানকের জন্ম হলেও তিনি মুসলিম সুফিদের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে তার বিশ্বাস, হিন্দুদের বর্ণপ্রথা, কঠোর রীতি পালন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী হিন্দু ভক্তদের শিক্ষা এবং হিন্দুদের বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করা ও প্রথম দিকের মুসলিম শাসকদের বাড়াবাড়ির বিরোধিতাকারী মুসলিম সুফিদের শিক্ষার ভালো দিকগুলোর মধ্যে সমন্বয় ছিল। 'এখানে কোনো হিন্দু নেই, কোনো মুসলমানও নেই'—তার এই ঘোষণার মধ্যে চমক সৃষ্টির মতো কিছু মনে না হলেও, নানক যখন তার বাণী প্রচারের মধ্য দিয়ে ঘোষণাটি ব্যাখ্যা করছিলেন এবং তার বিশ্বাসকে প্রয়োগ করছিলেন, তখন এর বিপ্লবী দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। যারা ধর্মীয় নির্দেশনা পেতে আগ্রহী ছিলেন, তারা দেখতে পেলেন, হিন্দু ও মুসলমানদের ঈশ্বর আসলে অভিন্ন—পার্থক্য ধর্মের প্রকাশে নয়, বরং প্রার্থনার চেতনার মধ্যে। তিনি একজন মুসলিম সংগীতশিল্পীকে নিজের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তিনি হিন্দুদের পবিত্র স্থানগুলোতে যেতেন এবং হজ পালনের জন্য মক্কায়ও যান। মন্দিরে তিনি হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিতেন এবং বেদ থেকে শ্লোক আওড়াতেন; আবার মসজিদে গিয়ে নামাজের কাতারে দাঁড়াতেন মুসল্লিদের সঙ্গে। কাবার দিকে অবনত হতেন। এভাবে তিনি দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে একটি ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করলেন দুই সম্প্রদায়ের অভিন্ন বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দান করে। তার বক্তব্যের ধর্মনিরপেক্ষ দিকগুলোর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ, তার ঘোষণা ইতিপূর্বেকার যে কারোর চাইতে সুস্পষ্ট ছিল যে কারো প্রতিবেশী হিন্দু না মুসলিম, তা তার দেখার প্রয়োজন নেই। পাঁচ নদী দ্বারা বিভক্ত ভূখণ্ড, যার নাম পাঞ্জাব, সেই ভূখণ্ডের বাসিন্দারা অভিন্ন জাতির লোক। কারণ, তাদের স্বার্থ অভিন্ন।

নানক, যিনি গুরু বা শিক্ষক, তিনি শিখ ধর্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা এবং পাঞ্জাবি জাতীয়তাবাদের জনক। তারপর শিখদের আরো নয়জন গুরু

এসেছিলেন। যদিও তারা তাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার মতো প্রধানত ধর্মীয় ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন, তবু তাদের প্রথম গুরুর মতো ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা বিকাশের দিকে অধিকতর গুরুত্ব দেন। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন (১৫৬৩—১৬০৬) অমৃতসরে একটি মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন একজন মুসলিম দরবেশ মিয়া মিরকে আহ্বান করেন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। তা ছাড়া শিখদের ধর্মীয় গ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহিব'-এর বাণী লিপিবদ্ধ করার সময় গুরুদের বাণীর পাশাপাশি মুসলিম দরবেশ ও হিন্দু সাধুদের বক্তব্যও স্থান দেন, যাতে পবিত্র গ্রন্থটিকে একটি অসাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া সম্ভব হয় এবং এ ক্ষেত্রে তিনি পাঞ্জাবি ভাষাকে পবিত্রতা দান করেন। মুসলমানরা আরবিতে এবং হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষায় তাদের প্রার্থনা উচ্চারণ করে।

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ সালে গুরু অর্জুনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। তার পুত্র ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ (১৫৯৫—১৬৪৪) নতুন সম্প্রদায়কে রক্ষার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। সব সম্প্রদায় থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করেন তিনি। এই নীতি শিখদের সর্বশেষ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের (১৬৬৬—১৭০৮) সময় পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়েছে। যদিও তার পিতা নবম গুরু ১৬৭৫ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, কিন্তু শিখদের মুসলিমবিরোধী আন্দোলন তিনি অনুমোদন করেননি। ১৬৯৯ সালের বসন্তকালে তিনি সামরিক ভ্রাতৃত্বের সূচনা করেন—যার নাম দেন খালসা, অর্থাৎ খাঁটি। মোগল নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তিনি। গুরুর দুই পুত্র মোগল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হওয়া সত্ত্বেও এবং অপর দুই পুত্র সিরহিন্দের মুসলিম গভর্নরের নির্দেশে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হলেও তিনি মুসলিম বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। ১৭০৮ সালের অক্টোবরে দুজন মুসলিম ঘাতকের দ্বারা নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি তার জীবনের মূল্য পরিশোধ করেন।

শিখরা ক্রমান্বয়ে একটি পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছিল তাদের নিজস্ব পবিত্র গ্রন্থ, বাণী, প্রার্থনাস্থল নিয়ে এবং তাদের মোগল স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন তাদের ঐতিহ্যের অংশে পরিণত হয়। বিপুলসংখ্যক হিন্দু জাট (কৃষক) বিদ্রোহী খালসায় যোগ দেয় এবং এভাবে শিখরা হিন্দুদের ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে—মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তারা। যদিও গুরু নানকের লক্ষ্য ছিল দুটি পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়কে এক বিশ্বাসের পতাকাতলে সমবেত করা, কিন্তু তার সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তিনি পাঞ্জাবি জাতীয়তাবাদের যে আলো জ্বালিয়েছিলেন, তা

গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পরও বহু বছর পর্যন্ত নির্বাপিত হয়নি ধর্মীয় ঘৃণা-বিদ্বেষের প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও।

শিখ বাহিনীর প্রথম বিজয় অর্জিত হয় ১৭০৯ সালে, যখন বান্দা বৈরাগী অশিক্ষিত কৃষকদের একটি বাহিনী পরিচালনা করেন। এই বাহিনী মোগল বাহিনীকে পরাজিত করে পূর্ব পাঞ্জাবের বিশাল এক এলাকা দখল করে নেয়। বান্দার সাফল্য স্বল্পস্থায়ী ছিল এবং ১৭১৫ সালের শীতকালে তিনি অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য হন। সাত শতাধিক অনুসারীসহ তাকে দিল্লিতে এনে মস্তক বিদীর্ণ করা হয়। বান্দা বৈরাগীর সামরিক অভিযান ছিল মুসলিম শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে এবং তিনি তাতে আংশিক সফলও হয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পূর্বে তিনি বলেন যে তার ঘৃণা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, মোগল নিপীড়নের বিরুদ্ধে। তার মতে, 'যখন মানুষ অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ ও অসৎ হয়ে পড়ে এবং সাম্যের পথ পরিহার করে সব ধরনের বাড়াবাড়ির পথ বেছে নেয়, তখন স্বর্গীয় প্রতিশোধ গ্রহণকারী আমার মতো চাবুককে প্রেরণ করেন তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। আর যখন শাস্তির মাত্রা পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তিনি আপনাদের মতো লোকদের ক্ষমতা দেন আমার মতো মানুষকে শাস্তি দিতে।'

সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য শিখরা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পাঞ্জাব থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পাঞ্জাবের মোগল গভর্নররা ছিলেন রক্তপিপাসু, যারা শিখদের হত্যা করাকে একধরনের কৌতুক বলে বিবেচনা করতেন এবং এর ফলে পাঞ্জাবের সমতলভাগে রক্তের স্রোত বয়ে যায়। ১৭৩৯ সালে পারসিক নাদির শাহ ভারতে অভিযান চালান। পাঞ্জাবের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করেন তিনি এবং তার পথে পড়েছে, এমন সব জনপদ ধ্বংস করেন। দিল্লিতে তার বাহিনী ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটতরাজ করে। তারা লক্ষাধিক লোককে হত্যা করে—নারী, পুরুষ, শিশুনির্বিশেষে। তার ফিরতি যাত্রা মন্থর ছিল, কারণ, তার হাতি, ঘোড়া, উট এবং গাধার বিশাল বহর ছিল ৩০ কোটি রুপির লুণ্ঠিত সামগ্রীতে বোঝাই। এসবের মধ্যে নগদ অর্থ ছাড়াও ছিল মূল্যবান অলংকার ও হীরক, ময়ূরসিংহাসন এবং বিখ্যাত কোহিনুর হীরক। এ ছাড়া কয়েক হাজার পুরুষ ও মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে যান দাস হিসেবে। এর ফলে তাদের পক্ষে দ্রুততার সঙ্গে পথ অতিক্রম করা সম্ভব হচ্ছিল না। মনে করা হয়েছিল যে শিখরা শেষ পর্যন্ত অবদমিত হয়েছে, কিন্তু এ পরিস্থিতির মধ্যে তারা পুনরায় আবির্ভূত হলো। তারা নিজেদের ছোট ছোট দলে সংগঠিত করল। নাদির শাহর বাহিনীর ওপর চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে লুটের মাল হাতিয়ে নেওয়া ছাড়া দাসত্বের ভাগ্য বরণ করা থেকে বেশ কিছু লোককে মুক্ত করতে

সক্ষম হলো। পারসিক হামলার মুখে তাদের ভূমিকা জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্য করে তুলল এবং দলে দলে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল পাঞ্জাবিরা। পাঞ্জাবের মুসলিম কৃষকেরা আবার শিখদের পাঞ্জাবিদের ভাই হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করল।

নাদির শাহর অভিযানের আট বছর পর আফগান আহমদ শাহ আবদালির উপর্যুপরি অভিযানের প্রথম হামলা পরিচালিত হয়। আবদালি মোট নয় দফা ভারত আক্রমণ করেছিলেন। এসব ক্ষেত্রেও শিখরা গেরিলাদলে সংগঠিত হয়ে হামলাকারী বাহিনীর ওপর আপতিত হয়।

আফগান হামলার এই সময়ে (১৭৪৭—৬৯) শিখরা শক্তির অধিকারী হয়। আবদালির প্রতিবারের হামলার সময় তারা পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করত। কিন্তু আফগানরা যখন দেশের উদ্দেশে ফিরত, তখন শিখরা তাদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের লুণ্ঠিত মালামাল ছিনিয়ে নিত এবং ভারতীয় বন্দীদের মুক্ত করত। আবদালির বারবার হামলার ফলে পাঞ্জাবি রাষ্ট্র গঠনের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। তিনি পাঞ্জাবে মোগল প্রশাসনকে ছিন্নভিন্ন করে দেন এবং উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তিকে নির্মূল করেন। তার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য পাঞ্জাবিরা তাদের ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়। শিখরা যেহেতু আফগানদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, সে জন্য তারা ক্ষমতা অধিকার করতেও সক্ষম হয়। যে বেপরোয়া লোকগুলো বিদেশি হামলাকারীদের পিঠটান দিতে বাধ্য করেছিল, তারা জাতীয় বীরে পরিণত হয় এবং সেখানেই তারা মুক্তিদাতা হিসেবে সংবর্ধনা পেয়েছে। এভাবে লক্ষাধিক শিখ ফ্রান্সের আয়তনের সমান একটি দেশের প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়।

মোগল ও আফগানদের বিরুদ্ধে সংঘাতের বছরগুলোতে শিখরা একটি সংবিধান বা নীতিমালা তৈরি করেছিল, যা শুধু তাদের নিজেদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। যেহেতু শিখরা নিজেদের একেকজন সরদার (প্রধান) বলে বিবেচনা করে, সে জন্য তারা এমন একটি সংগঠনের অংশ হতে চাইবে, যার মধ্যে তাদের নিজ নিজ স্বাধীনতা ও সমতার নিশ্চয়তা থাকবে। তারা এমন দল গঠন করে, যার নাম 'মিসল' (ফারসি 'মিসাল' শব্দের অর্থ 'অনুরূপ' অথবা 'সমান')। প্রতিটি 'মিসল'-এর নেতৃত্ব থাকে 'মিসালদার'-এর অধীনে এবং মিসালদার নির্বাচিত হন সেই ব্যক্তি, যিনি সাহসী ও দুর্দমনীয়। ক্রমে ক্রমে 'মিসল'গুলো বড় হতে থাকে তাদের আওতাধীন এলাকা সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। পাঞ্জাবের অধিকাংশ এলাকা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল এবং নিরাপত্তা করের বিনিময়ে তাদের এলাকার লোকদের নিরাপত্তার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল তারা। এ ধরনের ১২টি সাময়িক ভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়, যাদের অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৭০

হাজার। একপর্যায়ে মিসালদাররা নিজ নিজ এলাকার সামন্ত প্রভুতে এবং তাদের 'মিসল'গুলো ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়।

পাঁচটি 'মিসল'-এর তৎপরতা ছিল বেশি লক্ষণীয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল ভাঙ্গিদের মিসল, যারা নিয়ন্ত্রণ করত লাহোর, অমৃতসরসহ পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিকাংশ এলাকা। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মিসল 'কানহাইয়া', যারা দখল করেছিল হিমালয়ের পাদদেশের এলাকা। ফুলকিয়া 'মিসল' ছড়িয়ে ছিল পাতিয়ালা ও সিরহিন্দে। আহলুওয়ালিয়া মিসলের নিয়ন্ত্রণ ছিল রাভি ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। সুকেরচাকিয়া মিসল কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যাদের নিয়ন্ত্রণ সীমাবদ্ধ ছিল লাহোর থেকে চল্লিশ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকের গুজরানওয়ালা শহর ও আশপাশের এলাকায়।

মিসলগুলোকে যদি কোনো পদ্ধতি হিসেবে ধরা হয়, তাহলে বলা যায়, এগুলো ছিল তাৎক্ষণিক আয়োজন, বিশেষ করে বিদেশি হামলাকারীদের মোকাবিলায় গৃহীত তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা। বছরে দুবার সরদাররা অমৃতসরে মিলিত হতো তাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে এবং যখন এ ধরনের সমস্যা থাকত না, তখন নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির জন্য আলোচনা করত। পরবর্তী সময়ে এই বৈঠকগুলোর নাম হয় 'শরবত খালসা' (সকল খালসার সমাবেশ), যেখানে সমস্যা নিষ্পত্তির আলোচনা কোলাহলে রূপ নিত এবং বিবদমান পক্ষকে নিবৃত্ত করা কঠিন হয়ে পড়ত। একটি বিষয় স্পষ্ট ছিল যে পাঞ্জাবকে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে হয় এবং ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করতে হয়, তাহলে একটি মিসলকে দায়িত্ব নিতে হবে অন্য মিসলগুলোকে তার মধ্যে লীন করার জন্য। অতএব, এ প্রতিযোগিতা ছিল পাঁচটি 'মিসল'-এর মধ্যে। এদের মধ্যে সুকেরচাকিয়া মিসল ক্রমে গুরুত্ব অর্জন করে।

একজন ইংরেজ পর্যটক উইলিয়াম ফরস্টার, যিনি মিসলগুলোকে ক্ষমতার জন্য লড়াই করতে প্রত্যক্ষ করেছেন, ১৭৮৩ সালে তিনি লেখেন : 'ভবিষ্যতে কি এমন কোনো কারণ সৃষ্টি হবে, যখন শিখরা তাদের সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ও ধর্মকে রক্ষার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাবে। আমরা হয়তো এমন কোনো উচ্চাভিলাষী প্রধানকে দেখতে পাব, যিনি তার প্রতিভা দিয়ে তার সহযোগীদের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সফল হবেন এবং তাদের অভিন্ন স্বার্থের সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন সংহত রাষ্ট্রের অভ্যুদয় দেখাবেন।'

যে ব্যক্তি সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তখন তার বয়স মাত্র তিন বছর। তিনি ছিলেন সুকেরচাকিয়া মিসলের রণজিৎ সিং।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রণজিৎ সিংয়ের বংশপরিচয় জন্ম এবং অভিভাবকহীন বছরগুলো

রণজিৎ সিংয়ের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন সাধারণ কৃষক, যারা কৃষিকাজ করে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এ ছাড়া পশুপালনও করতেন তারা। এই পরিবারে প্রথম খ্যাতির অধিকারী হন বুধ সিং, যিনি স্বয়ং গুরু গোবিন্দ সিংয়ের দ্বারা খালসা মতে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। বুধ সিং বিদেশি হামলাকারীদের লুটের মালের অনুসন্ধানে থাকতেন। তার শক্তি ও সাহসিকতা এবং তার ডোরাকাটা অশ্ব দেসানের কারণে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি তার ঘোড়ার পিঠে উঠে পাঞ্জাবের সমভূমিতে পরিভ্রমণ করতেন এবং প্রবল বন্যার সময়েও বহুবার পাঞ্জাবের সুপ্রশস্ত নদীগুলো অতিক্রম করতেন। বুধ সিং ও তার ঘোড়া, বলা যায় অবিচ্ছেদ্য ছিল, যে কারণে তাদের একসঙ্গে বলা হতো দেসান বুধ সিং। ১৭১৮ সালে বুধ সিংয়ের মৃতদেহ আবিষ্কার করা হয় অস্ত্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন অবস্থায়। পুত্রদের জন্য তিনি রেখে গিয়েছিলেন কয়েকটি গ্রাম, যা তারা নিজেদের বলে দাবি করতে পারে এবং এর বাইরে আরো কিছু গ্রাম ছিল, যেসব গ্রামের বাসিন্দারা তাদের নিরাপত্তা কর দিত।

বধু সিংয়ের পুত্র নউধ সিং সুকেরচাক গ্রামকে সুরক্ষিত করে একটি বাহিনী গঠন করেন। যারা পরবর্তী সময়ে সুকেরচাকিয়া নামে পরিচিত হয়। সুকেরচাকিয়ারা অন্যান্য শিখ 'মিসল'-এর সঙ্গে যোগ দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আহমদ শাহ আবদালির বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি লড়াইয়ে অংশ নেয়। আফগানরা ফিরে গেলে তারা রাভি ও ঝিলাম নদীর মধ্যবর্তী বহু এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৫২ সালে এক সংঘর্ষে নউধ সিং নিহত হন।

নউধ সিংয়ের চার পুত্রের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ চারহাত সিং তার সদর দপ্তর সুকেরচাক গ্রাম থেকে গুজরানওয়ালায় স্থানান্তর করে শরহটির চারদিকে দুর্গ নির্মাণ করেন। লাহোরের আফগান গভর্নর চারহাত সিংকে পাকড়াও করতে ক্ষুদ্র একটি সেনাবাহিনী নিয়ে এলে শিখ বাহিনী তাকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। তা ছাড়া আফগানরা পেছনে ফেলে যায় অনেক বন্দুক ও রসদ। এই সাফল্যে চারহাত সিং তার নিয়ন্ত্রিত এলাকার আওতা আরো সম্প্রসারিত করেন। তিনি একে একে ওয়াজিরাবাদ, আহমেদাবাদ ও রোহতাস দখল করেন। কিন্তু আহমদ শাহ আবদালি আফগানিস্তান থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে হামলা করতে এলে চারহাত সিং জঙ্গলে পলায়ন করেন। আবদালি গুজরানওয়ালার দুর্গ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। আফগানরা যখন তাদের অভিযান শেষে ফিরে যাচ্ছিল, তখন চারহাত সিং অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তাদের লুণ্ঠিত মালামাল ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হন। গুজরানওয়ালার চারপাশ ঘিরে তিনি আবার দুর্গ গড়ে তোলেন এবং আশপাশের এলাকা দখল করেন। তিনি তার জীবনের শেষ হামলা পরিচালনা করেন জম্মুতে, যেখানে আবদালির অভিযান শুরুর পর থেকে পাঞ্জাবের বিত্তবান পরিবারগুলো আশ্রয় নিয়েছিল। ভাঙ্গি শিখরা জম্মু লুণ্ঠনে তার অধিকারের ব্যাপারে প্রবল আপত্তি জানায় এবং এক সংঘাতে নিজের বর্শার আঘাতে চারহাত সিং গুরুতর আহত হন।

চারহাত সিংয়ের একমাত্র পুত্র চৌদ্দ বছর বয়স্ক মাহা সিং পিতার সাহস ও উচ্চাভিলাষের উত্তরাধিকার লাভ করেন। জিন্দের প্রধান গজপাত সিংয়ের কন্যাকে বিয়ে করে তিনি মিসালদারদের মধ্যে নিজের শক্তি আরো বৃদ্ধি করেন। গুজরানওয়ালার দুর্গকে আরো শক্তিশালী করে এর নামকরণ করেন 'গরহি মাহা সিং'। তিনি তার অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছয় হাজারে উন্নীত করে পূর্বপুরুষদের মতো ভূখণ্ড সম্প্রসারণ করতে থাকেন। মাহা সিং এক মুসলিম উপজাতির হাত থেকে রসুলনগর দখল করেন। এ ছাড়া আলীপুর, পিন্ডি, ভাট্টিয়ান, শাহিওয়াল, ইসাখেল এবং শিয়ালকোট দখল করে নেন। এরপর মাহা সিং তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জম্মু আক্রমণ করেন। জম্মুর হিন্দু ডোগরা রাজা তার সুন্দর ও সমৃদ্ধ নগরী ছেড়ে পলায়ন করেন। জম্মু থেকে লুণ্ঠিত সম্পদের সাহায্যে মাহা সিং তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন সুকেরচাকিয়াদের মিসলগুলোর মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী মিসলে পরিণত করেন। ভাঙ্গি শিখদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল কানহাইয়া শিখরা। তারা মাহা সিংয়ের জম্মু লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে সুকেরচাকিয়াদের ওপর হামলা শুরু করল। এমনই এক হামলায় কানহাইয়া শিখপ্রধানের একমাত্র পুত্র গুরবক্স সিং নিহত হন। কানহাইয়াপ্রধানের অহংকার ধুলায়